أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ
تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا
يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ
فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

(৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ্ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) হাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল ; অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (৬০) যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (৬২) আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহ্রই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। (৬৭) তারা আল্লাহ্কে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ ..... فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ – এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোন বৃহত্তম অপরাধী, কাফের, পাপাচারীরও আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ্ তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাফের ও পাপাচারী কেয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহ্র আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম। কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না।

উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা, সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কেয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে ঃ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ –এরপর ওযর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্ হেদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আযাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হত! আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্র মাগফেরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত ; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি—মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত করলে আমরা পরহেযগার হয়ে যেতাম—এখানে কাফেরদের এ উক্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পুরোপুরিই হেদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেননি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, এজন্য সে নিজেই দায়ী।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ – مَقَالِيدُ শব্দটি **مقلاد** অথবা **مقليد** এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে **كليد** বলা হয়। আরবী রূপান্তর করে প্রথমে একে مَقَالِيدُ করা হয়েছে। এরপর

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾
وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ
وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَسِيْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾
قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ
نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

(৬৮) শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (৬৯) পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে—তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (৭০) প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৭১) কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭২) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৭৩) যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার!

এর বহুবচন اقليد ব্যবহৃত হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ্র হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে—

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم —এই কলেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কলেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নেয়ামত দান করেন। ইবনে জওযী এ ধরনের রেওয়ায়তকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফযীলতে ধর্তব্য হতে পারে।—(রূহুল-মা'আনী)

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ্র মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু مُتَشٰبِهٰتٌ —এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্র যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ্ তাআলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ এগুলো থেকে পবিত্র سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে, এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

صعق এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে।—(বয়ানুল-কোরআন) اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ — দুররে মনসূরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা-জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, সিংগা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ্ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে। সূরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صعق-এর পরিবর্তে فزع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ — অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে হিসাব -

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْۢبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ
اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا
يَغُرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ
الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ
لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۡ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٦﴾ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾

(৭৫) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র।

সূরা আল-মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৮৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু ঃ

(১) হা-মীম—(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (৪) কাফেররাই কেবল আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, আর তাদের পরে অন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৬) এভাবে কাফেরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী। (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

নিকাশের সময় সমস্ত পয়গম্বরগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে- إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ - ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে— مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ —উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে — وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم

نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ — উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্যে গমন করার অনুমতিও দেয়া হবে।—(তিবরানী) আবু নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়ীতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ, মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরূপে দেখব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কথা শুনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন ঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

সূরা আল-মু'মিন

সূরার বৈশিষ্ট ও ফযীলত ঃ এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আল-হা-মীম কোরআনের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ, সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলিকে عرائس অর্থাৎ, নববধূ বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরআনের নির্যাস হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম।— (ফায়ায়েলুল কোরআন)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্যে জায়গার খুঁজে বের হল। সে এক শস্য শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামল্য দেখেই বিস্ময় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। আর উর্বর বাগ-বাগিচা হল আল-হামীম। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ কারণেই বলেন, আমি যখন

কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌঁছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

বিপদাপদ থেকে হেফাযত ঃ মুসনাদ বাযযারে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মুমিনের প্রথম তিন আয়াত إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।— (ইবনে কাসীর)

শত্রু থেকে হেফাযত ঃ আবু দাউদ ও তিরমিযীতে হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবু সফরাহ্ (রাঃ)-এর সনদে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন এক জেহাদের রাত্রিকালীন হেফাযতের জন্যে বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে حٰمٓ لا ينصرون পড়ে নিও। অর্থাৎ, হা-মীম শব্দ দ্বারা দোয়া করতে হবে যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে حٰمٓ لا ينصرون (নুন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম-বললে শত্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শত্রু থেকে হেফাযতের দুর্গ।—(ইবনে কাসীর)

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) বলেন, দু'রাকআত নামায পড়ার জন্যে আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাযের পূর্বে সূরা মুমিনের إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্ছরে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামেনী পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো يا غافر الذنب اغفرلى অর্থাৎ, হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, যখন وَقَابِلِ التَّوْبِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يا قابل التوب اقبل توبتى অর্থাৎ, হে তওবা কবুলকারী, আমার তওবা কবুল করুন, যখন شَدِيدِ الْعِقَابِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يا شديد العقاب لا تعاقبنى অর্থাৎ,হে কঠোর শাস্তিদাতা,আমাকে শাস্তি দেবেন না এবং যখন ذِي الطَّوْلِ পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো يا ذا الطول طل على بخير অর্থাৎ, হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহকরুন।

সাবেত বেনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খুঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন এয়ামেনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোন লোক দেখিনি।

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের জন্যে হযরত ওমর ফারুকের এক মহান নির্দেশ ঃ ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন, তার কথা বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে। অতঃপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ—

ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে—তোমার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্যে সে আল্লাহ্র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

অতঃপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্যে দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তাআলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর সে কান্না শুরু করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহর রহমতের ভরসা দাও এবং আল্লাহ্র কাছে তার তওবার জন্যে দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ, তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দ্বীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য।—(ইবনে কাসী)

যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্যে এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্যে নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোন ফায়দা তো হবেই না; বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ- حٰمٓ কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই مُتَشَابِهَاتٌ যার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন ; অথবা এগুলো আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত।

غَافِرِ الذَّنْبِ পাপ ক্ষমাকারী ও وَقَابِلِ التَّوْبِ তওবা কবুলকারী – এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তাআলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ।

ذِي الطَّوْلِ এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।—(মাযহারী)

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا এই আয়াত কোরআন সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان جدالاً فى القران كفر অর্থাৎ, কোরআন সম্পর্কে কোন কোন বিতর্ক কুফর।— (মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে কোরআনের কোন এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল।— (মাযহারী)

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝٨ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ
فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ
اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١٠ قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى
خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝١١ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ
كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝١٢
هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ
وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝١٣ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝١٤ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ
يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ
يَوْمَ التَّلَاقِ ۝١٥ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ
مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝١٦

(৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (১০) যারা কাফের তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতঃপর তোমরা কুফরী করেছিলে। (১১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু' বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু' বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতঃপর এখনও নিষ্কৃতির কোন উপায় আছে কি? (১২) তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের হয়ে যেতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীককে ডাকা হত, তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ্ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান। (১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুযী। চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু থাকে। (১৪) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাক, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (১৬) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র।

উপরোক্ত বিতর্কের অর্থ কোরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতে এরূপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নতের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিকৃত করার নামান্তর। নতুবা কোন অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা গবেষণা করা উপরোক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয় ; বরং এটা পুণ্য কাজ।— (বায়যাভী, কুরতুবী, মাযহারী)

فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ কোরায়শরা শীতকালে এয়ামনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহ্‌র সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্যে গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হলে এসব নেয়ামত ও ধনৈশ্বর্য ছিনিয়ে নেয়া হত। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোঁকায় না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুতঃ বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত হয়ে বছরে কোরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চার জন এবং কেয়ামতের দিন আট জন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের সারির সংখ্যা লাখ পর্যন্ত বর্ণিত আছে তাদেরকে 'কারুবী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্যে, বিশেষতঃ যারা গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্যে বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ্ তাআলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্যে দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্‌র বন্দাদের মধ্যে মুমিনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ। মুমিনদের জন্যে তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক।

এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াও করেন— وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ – তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফেরাতের যোগ্য, অর্থাৎ, যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদের সাথেই জান্নাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্যে ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের

পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কোআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়র (রাঃ) বলেন, মুমিন জান্নাতে পৌছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা তোমার মত আমল করেনি। (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। মুমিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যেই করিনি-তাদের জন্যেও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে।— (ইবনে-কাসীর)

এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উক্তি হলেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তির পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে صالحية তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান, আমলসহ ঈমান নয়।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ কেউ কেউ درجات –এর অর্থ করেছেন গুণাবলী। অতএব, رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ –এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন যে, এর অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহ্র আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা মাআরেজে বলা হয়েছে—

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলেমের মতে আল্লাহ্র আরশ একটি লাল ইয়াকূত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ –এর অর্থ আল্লাহ্ তাআলা মুমিন-মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কোরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে, نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ অন্য এক আয়াতে আছে هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ –এর মর্ম এই যে, হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না; তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি يَوْمَ التَّلَاقِ ও يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ –এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, يَوْمَ التَّلَاقِ তথা সাক্ষাত ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ –এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেয়া হবে, যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এরপরে لِمَنِ الْمُلْكُ বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত অবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই ঃ সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ-খণ্ডে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোন গোনাহ্ করেনি। তখন আল্লাহ্র আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজকের দিনে রাজত্ব কার?)

মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ মুমিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হৃষ্টচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফেররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আযরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন এবং এক আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ্ বলবেন, 'আজকের দিনে রাজত্ব কার?' তখন যেহেতু কোন জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ্ নিজেই জওয়াব দেবেন ঃ 'প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্র।' হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এতে আল্লাহ্ তাআলাই প্রশ্নকারী এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযীও তাই বলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়—কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেন, انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون অর্থাৎ, আমিই বাদশাহ্ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তফসীর দুররে মনসূরে উল্লেখিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে ; এ প্রশ্নটি উপরোক্ত একবার প্রথম ফুঁৎকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, দু'বার মেনে নেয়ার উপরই কোরআন পাকের তফসীর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা সম্ভবপর যে, উল্লেখিত আয়াতে প্রথম ফুঁকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝١٧ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى
الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۭ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ
يُّطَاعُ ۝١٨ يَعْلَمُ خَاۗىِٕنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ۝١٩
وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا
يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝٢٠ اَوَلَمْ
يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي
الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
مِنْ وَّاقٍ ۝٢١ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢٢ وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٣ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ
هَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٢٤ فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ
بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَاۗءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
وَاسْتَحْيُوْا نِسَاۗءَهُمْ ۭ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝٢٥

(১৭) আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ যুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৮) আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে। (১৯) চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (২০) আল্লাহ্ ফয়সালা করেন সঠিকভাবে, আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২১) তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখত তাদের পূর্বসূরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। (২২) এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করত, অতঃপর তারা কাফের হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাদের ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা। (২৩) আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, অতঃপর তারা বলল, সে তো জাদুকর, মিথ্যাবাদী। (২৫) অতঃপর মূসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছাল ; তখন তারা বলল, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَعْلَمُ خَاۗىِٕنَةَ الْاَعْيُنِ –অপরের অলক্ষ্যে নর-নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকানো এবং কাউকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া অথবা অন্যে অনুভব করতে পারে না এমনভাবে তাকানো, এগুলোই দৃষ্টির চুরি। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এগুলো গোপন নয়, দেদীপ্যমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরাউন বংশীয় মুমিন ঃ উপরে স্থানে স্থানে তওহীদ ও রেসালত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্যে উপরোক্ত প্রায় দু'রুকূতে হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মোকাতেল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে মূসা (আঃ)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মূসা (আঃ)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَجَاۗءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى

এই মুমিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবীব' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সোহায়লীর মতে, এই মুমিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার নাম 'হিযকীল' বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মুমিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবু বকর। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ।—(কুরতুবী)

يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ — এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মুমিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্যে কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কেউ মুমিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয়। এর প্রয়োজন কেবল এ জন্যে

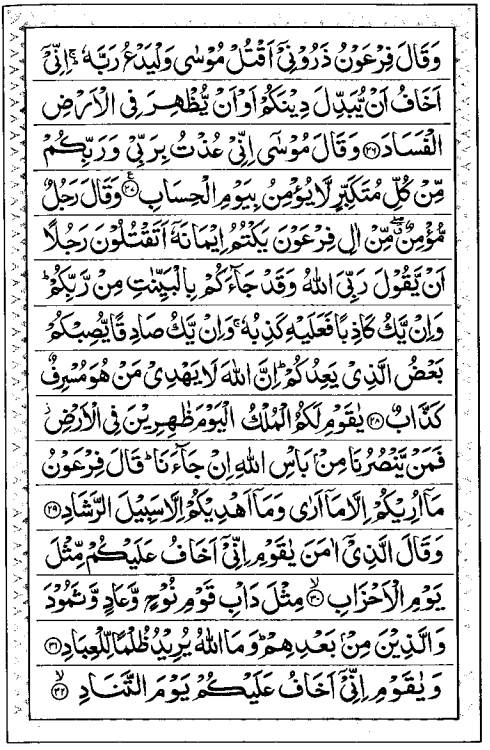

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ
اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ
الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ
مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ
مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا
اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۭ
وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ
فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۭ قَالَ فِرْعَوْنُ
مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾
وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ
يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ
وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾
وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

(২৬) ফেরাউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (২৭) মূসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি। (২৮) ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কওম, আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আমাদের আল্লাহ্র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। (৩০) সে মুমিন ব্যক্তি বলল: হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি। (৩১) যেমন, কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্ বন্দাদের প্রতি কোন যুলুম করার ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্যে প্রচণ্ড হাঁক–ডাকের দিনের আশংকা করি,

যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না।—(কুরতুবী)

ফেরাউন গোত্রের মুমিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও ফেরাউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মূসা–হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ — تناد এটা تنادى এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থ একে অপরকে ডাক দেয়া। কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে يَوْمَ التَّنَادِ বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ্ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। অতঃপর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আ'রাফ–বাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতঃপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না।—(মাযহারী) মুসনাদে বাযযার ও বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে।

হযরত আবু হাযেম আ'রাজ (রাঃ) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আ'রাজ, কেয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক–তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তখনও দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ, তুমি সর্বপ্রকার গোনাহ্ই সঞ্চয় করে রেখেছ।—(মাযহারী)

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ
اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ
لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ
مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾ ۨ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ
اَتٰىهُمْ ۭ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ
اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ
لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ
اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۭ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْۗءُ
عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾
وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ
عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗىِٕكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

(৩৩) যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৪) ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অতঃপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পরে আর কাউকে রসূলরূপে পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের একাজ আল্লাহ্ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (৩৬) ফেরাউন বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পৌঁছে যেতে পারব (৩৭) আকাশের পথে, অতঃপর উঁকি মেরে দেখব মূসার আল্লাহ্কে। বস্তুতঃ আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৩৮) মুমিন লোকটি বলল : হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। (৩৯) হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (৪০) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ –অর্থাৎ, তোমরা যখন পেছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, উপরে يَوْمَ التَّنَادِ-এর তফসীরে উল্লেখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন পথ থাকবে না। তাদের মতে يَوْمَ التَّنَادِ বলতে প্রথম ফুঁকের সময় বোঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আর্তচীৎকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত আয়াতের অপর কেরাত ند থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা ند ধাতু থেকে উদগত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর অনুযায়ী يَوْمَ التَّنَادِ এর অর্থও পলায়নের দিন এবং تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ –এরই ব্যাখ্যা।

তফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক দীর্ঘ হাদীসে কেয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নফখায়ে ফাযা' বলা হয়। দ্বিতীয় ফুঁকের ফলে সবাই বেহুঁশ হয়ে মারা যাবে। একে 'নফখায়ে ছ'ক' বলা হয়। তৃতীয় ফুঁকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নফখায়ে নশর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুঁকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, وهو الذى يقول الله عنه يوم التناد – ফলে জানা গেল যে, আয়াতে يَوْمَ التَّنَادِ বলে প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে। والله اعلم

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ – অর্থাৎ, ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আঃ) ও মুমিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে مُتَكَبِّرٍ ও جَبَّارٍ শব্দদ্বয়কে قَلْبِ –এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভাল-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ, অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا –এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে খোদাকে দেখে নিতে চাই। বলাবাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾
تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ
وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ
اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ
اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ
مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ
بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ
بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْۗءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۤ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ
فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَاِذْ يَتَحَاۗجُّوْنَ فِي النَّارِ
فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ
بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

(৪১) হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে (৪২) তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। (৪৩) এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই! আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। (৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে। (৪৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (৪৬) সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। (৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বির্তক করবে, অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন।

এটা 'হবু রাজার গবু মন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানোনো ও দেখানোর জন্যে এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহীহ্ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। যা উচ্চতায় পৌছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ

–এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশে মুমিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু আযাব যখন তোমাদেরকে গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মোকাতেল বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْۗءُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে নিল। মুমিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার জন্যে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মুমিন বান্দাকে মূসা (আঃ)–এর সাথে রক্ষা করা হয়, এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۤ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ–এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল–সন্ধ্যা দু' বার জাহান্নামের সামনে হাযির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল।– (মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল–সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কেয়ামতের হিসাব–নিকাশের পর সে পৌছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ
قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۵۰
اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝۵۱ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۗءُ الدَّارِ ۝۵۲ وَلَقَدْ
اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝۵۳
هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝۵۴ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝۵۵ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ
اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ
مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ ۝۵۶ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۵۷ وَمَا
يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْۗءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۵۸

(৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা বলবে হাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়। (৫১) আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। (৫২) সেদিন যালেমদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে থাকবে মন্দ গৃহ। (৫৩) নিশ্চয় আমি মূসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েতস্বরূপ। (৫৫) অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকর্মী। তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাক।

কবরের আযাব ঃ কবরের আযাব যে সত্য, উপরোক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতের হাদীস এবং 'উম্মতের ইজমা' এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا – এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বর যেমন, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়ব (আঃ)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে। যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে এর জওয়াব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তা পয়গম্বরগণের বর্তমানে তাঁদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বর ও মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গম্বর-হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়র (আঃ)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আযাব দেয়া হয়েছে। ঈসা (আঃ)-এর শত্রুদের উপর আল্লাহ্ তাআলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কেয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুদেরকে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ –যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মুমিনগণের জন্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ —অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অন্তরে অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলে এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না। —(কুরতুবী)

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ
لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ
اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ
الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ
مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

(৫৯) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার এবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে। (৬১) তিনিই আল্লাহ্, যিনি রাত্র সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬২) তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। (৬৪) আল্লাহ্ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ্ বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি এবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর। (৬৬) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

দোয়ার স্বরূপ ঃ দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকরকেও দোয়া বলা হয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্যে শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গম্বরগণকেই বলা হত, দোয়া করুন ; আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্যে ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের তফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, ان الدعاء هو العبادة অর্থাৎ, দোয়াই এবাদত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরণিক নিয়মে ان الدعاء هو العبادة বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, এবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও এবাদত যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত এবং প্রত্যেক এবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, এবাদত বলা হয় কারও সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা এবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক এবাদতের সারমর্মও আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার হাম্দ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। (অর্থাৎ, তার অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ঃ

من شغله القران عن مسألتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়া ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير –এতে এবাদত ও যিকরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোয়া অর্থে এবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে, যদি সে অহংকারবশতঃ বর্জন করে। কেননা, অহংকারবশতঃ দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের

যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না করলে গোনাহ্ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলেমের মতে মোস্তাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ।—(মাযহারী)

দোয়ার ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই।—(তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, الدعاء مخ العبادة দোয়া এবাদতের মগজ।—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা যাঞ্ছা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্যে দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎএবাদত।-(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হন।—(তিরমিযী)

তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া না করার কারণে আল্লাহ্র গযবের হুমকি তখন প্রযোজ্য, যখন কেউ নিজেকে বড় ও বেপরোয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপারক হয়ো না ; কেননা, দোয়াসহ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।—(ইবনে হাব্বান)

এক হাদীসে আছে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর।—(হাকেম)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যার জন্যে দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহ্র কাছে করা হয়নি।—(তিরমিযী) عافيت তথা 'নিরাপত্তা' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হেফাযত ও প্রত্যেক অভাব-অনটন পূরণই অন্তর্ভুক্ত।

কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া করা হারাম। এরূপ দোয়া কবুল হয় না।

দোয়া কবুলের ওয়াদা ঃ উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বন্দা আল্লাহ্র কাছে যে দোয়া করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, মুসলমান আল্লাহ্র কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ্ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া। (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া।—(মাযহারী)

দোয়া কবুলের শর্ত ঃ উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যতঃ কোন শর্ত উল্লেখ নেই। এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবুলের শর্ত নয়। কাফের ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন। ইবলীস কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা তা কবুল করেছেন। দোয়ার জন্যে কোন সময় এবং ওযু শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' 'ইয়া রব' বলে দোয়া করে ; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হবে ?—(মুসলিম)

এমনিভাবে অসাবধান বেপরোয়া ও অন্যমনস্কভাবে দোয়ার বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে।—(তিরমিযী)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্র নেয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কতিপয় নিদর্শন পেশ করে তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا — চিন্তা করুন, নিদ্রা কত বড় নেয়ামত! আল্লাহ্ তাআলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের জন্যে যেমন নিজ নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করে, নিদ্রাও যদি তেমনি ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরেও কাজ-কারবারের শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে। বিভিন্ন সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিঘ্নিত হয়ে যেত এবং নিদ্রিতদের সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল মানুষের নিদ্রার সময় নির্দিষ্ট থাকত এবং জন্তু-জানোয়ারের নিদ্রার সময় ভিন্ন হত, তবুও মানুষের কাজের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ —মানুষের আকৃতি আল্লাহ্ তাআলা সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও শিল্পসামগ্রী তৈরী করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতে সাহায্যে করে। সাধারণ জন্তু-জানেয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফল-মূল, তরি-তরকারী, মাংস ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুক্ত করে খায়। এক এক ফল দ্বারা রকমারী খাদ্য-আচার, মোরব্বা ও চাটনী তৈরী করে খায়।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا
يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ
اٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ
اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ
اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۭ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي
النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ
قَبْلُ شَيْـــًٔا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾
اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

(৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই বলেন, হয়ে যা—তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে, (৭৩) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৪) আল্লাহ্‌ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ–উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল! (৭৭) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সবাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُسْحَبُوْنَ فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ —এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حميم অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিতে ও পরে جحيم অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, حميم জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্যে জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা সাফ্‌ফাতের আয়াত ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ থেকেও তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, حميم ও جحيم একই স্থান এবং حميم –এর মধ্যেই جحيم অবস্থিত। আয়াতটি এই ঃ

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে–কাসীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে এবং কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا – অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা বলবে — আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ —

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ

–এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং مرح –এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ–সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مرح সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فرح অর্থাৎ, আনন্দ যদি ধন–সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গোনাহের কাজ দ্বারা হয়, তবে হারাম ও না–জায়েয। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও مرح এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ — অর্থাৎ, আনন্দ–উল্লাস করো না। আল্লাহ্‌ তাআলা আনন্দ–উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ–উল্লাসের আরেক স্তর হল পার্থিব নেয়ামত ও সুখকে আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মোস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا অর্থাৎ, এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে مرح –কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা হয়েছে এবং فرح –এর সাথে بِغَيْرِ الْحَقِّ কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া এবাদত ও সওয়াবের কাজ।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ —এ আয়াত থেকে জানা যায়

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ
بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ
لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ
لِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّ
اٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾
فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ
وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللّٰهِ
الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

(৭৮) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৭৯) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। (৮০) তাতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। অতএব, তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। (৮৩) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। (৮৪) তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। (৮৫) অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ্‌র এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বন্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সানন্দে কাফেরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার জন্যে আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের আযাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে—আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। কাফেরদের আযাবে অপেক্ষা করা বাহ্যতঃ 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বজগতের জন্যে রহমত) গুণের পরিপন্থী। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরপরাধ মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী নয়। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়া কারও মতেই দয়ার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ –অর্থাৎ, এই অপরিণামদর্শী কাফেরদের কাছে যখন আল্লাহ্‌র পয়গম্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে পয়গম্বরগণের জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গম্বরগণের উক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হল। কাফেররা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্খতা ছিল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে একেই জ্ঞান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের 'ইলাহিয়্যাত' সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা প্রথমোক্ত নিরেট মূর্খ শ্রেণীর জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোন দলীল নেই। এগুলোকে জ্ঞান বলা জ্ঞানের অবমাননা বৈ নয়। কাফেরদের পার্থিব জ্ঞানের উল্লেখ কোরআন পাক সূরা রূমে এভাবে করেছে – يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে, বোঝে; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিক জ্ঞান, অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কেয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গম্বরগণের জ্ঞানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।— (মাযহারী)

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ ... অর্থাৎ, আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে- يقبل الله توبة العبد مالم يغرغر অর্থাৎ, মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা বন্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর তওবা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈমান কবুল হয় না।

সূরা মু'মিন সমাপ্ত

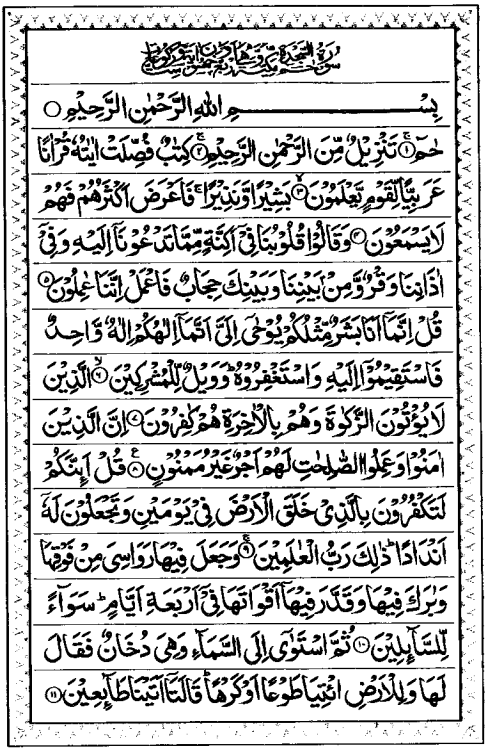

سورة حم السجدة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا
عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ
اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾
قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦﴾ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٨﴾ قُلْ اَئِنَّكُمْ
لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ
اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا
وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۗ سَوَآءً
لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿١١﴾

সূরা হা-মীম সেজদাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হা-মীম, (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। (৯) বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু' দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। (১০) তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন— পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।

সূরা হা-মীম সেজদাহ

পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের জন্যে 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণতঃ সূরা মু'মিনের হামীমকে 'হা-মীম' আল-মু'মিন' এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা-মীম আস্‌সাজদাহ' অথবা হা-মীম 'ফুসসিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কোরায়শ গোত্র, তাদের সামনে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা কোরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অসংখ্য মো'জেযা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জওয়াবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে কোরায়শকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবী ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ – تفصيل -এর আসল অর্থ বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা — পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কোরআন পাকের আয়াতসমূহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থীদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ, যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া— এসব বিষয় তাদের জন্যে উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কোরায়শরা এসব সত্ত্বেও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ আয়াতে তাই উল্লেখিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে কাফেরদের একটি প্রস্তাব : আলোচ্য সূরায় কোরায়শ কাফেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কোরায়শ সরদার

হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কোরায়শ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেয ইবনে কাসীর মুসনাদে বাযযার, আবু ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আস-সীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এস্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব — যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাকনাম,) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল ঃ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা 'ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তেলাওয়াত করতে করতে যখন فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেজদার আয়াতে পৌঁছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন ঃ আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম, আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌঁছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই ঃ

আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহ্র কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়-বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কোরায়শ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবেলা ও তাঁকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা, তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরায়শের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইযযত হবে তোমাদেরই ইযযত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ – এ ক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক, আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি না। দুই, আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন, আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কোরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আনআমের আয়াতে আছে— وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا -এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী-ইসরাঈল ও সূরা কাহ্ফেও রয়েছে।

এর জওয়াব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কোরআন তাদের অবস্থা

বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। — (বয়ানুল-কোরআন)

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জওয়াব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মোকাবেলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ্ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মো'জেযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা এবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের জন্যে তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্যে রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ, তারা যাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফেরদেরকে যাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাযের সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নেসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় যাকাত ফরয ছিল না।

কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কিনা ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফেকাহবিদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের বিধানাবলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করবে। ঈমানের পরে ফরয কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব, তাদের উপর যখন যাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জওয়াব এই যে, অনেক ফেকাহবিদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি; বরং তাদের যাকাত না দেয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মুমিন হলে যাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া। — (বয়ানুল-কোরআন)

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জওয়াবে বলেন যে, কোরায়শ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরায়শরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ — مَمْنُونٍ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশতঃ তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ্ বোখারীতে হযরত আবু মূসা আশআরী থেকে, শরহুস্‌সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রাঃ) থেকে এবং রাযীনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। — (মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুশিয়ারী ও বিবরণ সূরা বাক্বারার তৃতীয় রুকূতে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে—

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

সূরা বাক্বারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোন্‌টির পর কোন্‌টি এবং কোন্ কোন্ দিনে সৃজিত হয়েছে ঃ বয়ানুল কোরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কোরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টির পরে কোন্‌টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবতঃ মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে — (এক), — হা-মীম সাজদার আলোচ্য আয়াত, (দুই) – সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত আয়াত এবং (তিন) — সূরা নাযেয়াতের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا

বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাক্বারা ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযেয়াতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকী প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। — (বয়ানুল কোরআন – সূরা বাক্বারা)

সহীহ্ বোখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা থানভী (রহঃ) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে রবিবার ও সোমবার দিন, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার দিন, উদ্ভিদ, ঝরণা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চার দিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَاءً لِّلسَّآئِلِيْنَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার দিন আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকী থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সেজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে। — (ইবনে-কাসীর)

ইবনে-কাসীরের মতে হাদীসটি غريب (অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।)

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিকাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াত আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

– অর্থাৎ, আমি আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। — (ইবনে-কাসীর)

ইবনে-আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً — (মাযহারী)

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে-কাসীর মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াতকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। তৃতীয়তঃ জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলীর সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দু'দিনের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযেয়াতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল-কোরআনের বক্তব্য অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝরণা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে — وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ —এতে তফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ বলার পর

যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা-আপনিই জানা যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চার দিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল — দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের خلق فيها رواسى من فوقها বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا — ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্যে পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরী ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে مِنْ فَوْقِهَا বলে এই নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ — اقوات শব্দটি قوت -এর বহুবচন। অর্থ রিযিক, রুযী, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। — (যাদুল-মাসীর)

হযরত হাসান ও সুদ্দী এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুযী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজায ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্নরূপ হয়েছে। কোন ভূ-খণ্ডে গম, কোন ভূ-খণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা, কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোন ভূ-খণ্ডই অন্য ভূ-খণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূ-খণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহা-গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীব-জন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূ-গর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চার দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার থেকে কিছু বেশীও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, একাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِّلسَّائِلِينَ -এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্যে এই গণনা। ইবনে-জরীর ও দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চার দিনে হয়েছে। —(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

ইবনে-যায়েদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ ... وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِلسَّائِلِينَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سائلين -এর অর্থ নিয়েছেন, প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী তাদের উপকারার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سائلين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে —(বাহ্‌রে-মুহীত)

ইবনে-কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কোরআনের এ আয়াতের অনুরূপ اعطاكم من كل ما سالتموه অর্থাৎ, তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ কোন কোন তফসীরবিদের মতে, আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোন রূপক অর্থ নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা, অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেয়ার জন্যে তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূ-খণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ্ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহ্‌র বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে ''বায়তুল-মামুর'' বলা হয়।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۭ
وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ڰ وَحِفْظًا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ
عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَاۗءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ قَالُوْا لَوْ شَاۗءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰۗىِٕكَةً
فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۭ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ
الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۭ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ
لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى
فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ
نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاۗءُ
اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا مَا جَاۗءُوْهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১২) অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু' দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা। (১৩) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামূদের আযাবের মত (১৪) যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব, আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম। (১৫) যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। (১৬) অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (১৭) আর যারা সামূদ, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ এসে ধৃত করল। (১৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। (২০) তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا এটা صٰعِقَةٌ এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও সামূদের صٰعِقَةٌ বলে বর্ণিত হয়েছে। صٰعِقَةٌ শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صٰعِقَةٌ বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صٰعِقَةٌ ছিল। একেই ريح صرصر নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু, যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। — (কুরতুবী)

যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষ দিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ যে কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে। — (কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কোন জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ ইসলামের নীতি এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্যে অশুভ হওয়া জরুরী হয় না। — (মাযহারী, বয়ানুল-কোরআন)

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এটা وزع থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেয়া, নিষেধ করা। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেয়া হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে, কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। — (কুরতুবী)

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۭ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ
الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ
سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ
ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ
يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ
الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاۗءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا
خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ
وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَاۗءُ اَعْدَاۗءِ اللّٰهِ النَّارُ ۭ لَهُمْ فِيْهَا
دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না — এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। (২৩) তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। (২৪) অতঃপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবুল করা হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত। (২৬) আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। (২৭) আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আল্লাহ্র শত্রুদের শাস্তি-জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ ..... আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোন গোনাহ্ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত, পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোন অপরাধ ও গোনাহ্ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তওহীদ ও রেসালত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন, তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই জাজ্জ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজ-কর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলাবাহুল্য, তোমাদের এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান ঃ সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বন্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে হে পরওয়ারদেগার, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ্ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বন্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ, ভাল কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যাকিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্যে করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। — (মাযহারী)

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যাকিছু আমার মধ্যে করবে, কেয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ
غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا
السَّيِّئَةُ ۭ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ
عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا
يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۭ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ
الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿٣٨﴾

(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। (৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী কর। (৩২) এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (৩৩) যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? (৩৪) সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (৩৬) যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৭) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর। (৩৮) অতঃপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুণ্য কাজ করে নেয়া, যাতে আমি এসম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনও পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে। —(কুরতুবী)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ কাফেররা কোরআনের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কোরআন তেলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। —(কুরতুবী)

নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব ঃ হৈ-হুল্লোড় করা কাফেরদের অভ্যাস ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরও জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরা তাদের কাজ-কর্মে এবং গ্রাহকরা খানাপিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যতঃ এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যা কাফেরদের আলামত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কোরআন তেলায়াতের জন্যে রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্যে খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, রেসালত ও তওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আযাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামেলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্যে বিশেষ পথনির্দেশ উল্লেখিত হয়েছে। মুমিন ও কামেল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল, পুরোপুরিভাবে শরীয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্যে সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا –এর অর্থ ঃ বলা হয়েছে ঃ استقامت অর্থাৎ, যারা খাঁটি মনে আল্লাহকে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে (এটা হল মূল ঈমান) অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সৎকর্ম।)। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। استقامت শব্দের অর্থ ঈমান ও তওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ওসমান (রাঃ) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি استقامت –এর অর্থ করেছেন, খাঁটি আমল করা। হযরত

ওমর (রাঃ) বলেন– আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম استقامت—(মাযহারী)

তাই আলেমগণ বলেন, استقامت সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ — একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবী এই যে, মানুষ এবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ ছাকাফী (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর অন্য কারও কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, قل آمنت بالله ثم استقم অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর; অতঃপর তাতে অবিচল থাক।— (মুসলিম) এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবী অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) استقامت-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ ফরয কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী বলেন, استقامت এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, استقامت -এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ — ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ বলেন — হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ্ বলেন, তিন সময়ে হবে — প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন — আমি তো বলি যে, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও তাদের শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম সেজদা তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে, তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। — (মাযহারী)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবী করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে — তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোন বড় লোকের মেহমান হয়।— (মাযহারী)

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা-আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে।— (মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে।— (মাযহারী)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ — এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَآ إِلَى اللَّهِ বাক্যের পর وَعَمِلَ صَالِحًا বলে আযান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত নামায বোঝানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।— (মাযহারী)

হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেয়ার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযান দেয়া হয়।— (মাযহারী)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ এখান থেকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ —অর্থাৎ, দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন — এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মোকাবেলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।— (মাযহারী)

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।— (কুরতুবী)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ عَلٰي كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۭ
اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِعْمَلُوْا
مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا
جَاۗءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۭ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا
قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ
اَلِيْمٍ ۝ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۭ
ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۭ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاۗءٌ ۭ وَ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۭ اُولٰۗىِٕكَ
يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

(৩৯) তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা কর। (৪১) নিশ্চয় যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। (৪২) এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিকে থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৩) আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৪) আমি যদি একে অনারব ভাষায় কোরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল আরবীভাষী! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়। (৪৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। তারা কোরআন সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত। (৪৬) যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বন্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।

আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা জায়েয নয় ঃ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ — এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোন নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই সেজদা এবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ এবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে।

এবাদতের উদ্দেশে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোন উম্মত ও শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা, এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদমকে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেয়া হয়েছিল। ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ এ বিষয়ে ফেকাহ্‌বিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন্ আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবু বকর আহ্‌কামুল কোরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথম আয়াত অর্থাৎ, اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ এর শেষে সেজদা করতেন। ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, لَا يَسْـَٔمُوْنَ -এর শেষে সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমরও তাই বলেছেন। এ কারণে মসরূক, আবু আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ প্রমুখ ফেকাহ্‌বিদগণ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহ্‌কামুল কোরআনে আরও বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলেমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا — এর পূর্বের আয়াতে যারা রেসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। الحاد ও لحد -এর আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা, কবরকেও এ কারণেই لحد বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাস কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যতঃ ঈমান দাবী করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ্ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্দ্বারা

কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, الالحاد هو وضع الكلام على غير موضعه আয়াতের لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ্ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী।

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ, মুখে কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেয়ার দাবী ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কিতাবুল খেরাজে বলেন, كذلك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবী করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম-অর্থে এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান ঃ আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয় যে, যে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা-পূজারী ও ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা-পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কোরআনে উল্লেখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى অর্থাৎ, আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্যে করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহ্রই এবাদত করি। কিন্তু কোরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্র বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলেম ও ফেকাহ্বিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্যে শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়া, ফজরের দু'রাকআত ও যোহরের চার রাকাআত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোরআনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপেও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত-প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه من الدين بالضرورة অর্থাৎ, এমন সব বিষয়ে নবী করীম (সাঃ)- এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্জ্বল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। অর্থাৎ, আলেমগণ তো জানেনই — সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিশ্চিত ও জাজ্জ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে অস্বীকার করা।

অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ -অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذكر বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا বাক্যটি পূর্ববর্তী إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ বাক্য থেকে بدل হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আযাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে باطل বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাদ্দিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবু-হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যেই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল কোরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপন্থীর সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই।

তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, কোরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই – এক খোলাখুলিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই বাহ্যতঃ ঈমান দাবী করা, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ সংযোজনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে وَلَا مِنْ خَلْفِهِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন

করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এরঅর্থ সত্তার বিকৃত করে বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বোঝে। কোরআন চৌদ্দশ' বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলেম থেকে নিয়ে জাহেল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهٖ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বলে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি ; বরং এর অর্থ-সম্ভারের হেফাযত করাও আল্লাহ্ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ-সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেদ্বীন-মুলহেদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলেম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যান। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বাক্যে لَهٗ-এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল ভাষার নাম নয়; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যতঃ মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের হেফাযত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কোরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক, আল্লাহ্র কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

وَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ — আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে اعجم বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে, যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুতঃ اعجم বলা হবে তাকেই, যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না। — (কুরতুবী)

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় কোরআন নাযিল করতাম, তবে কোরায়শরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ —এখানে কোরআনের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে — (এক) কোরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। (দুই) কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কোরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফলও হয়।

اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে انت تسمع من قريب অর্থাৎ, তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে انت تنادى من بعيد অর্থাৎ, তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। — (কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌঁছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ
أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ
مَحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ
فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ
مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ
رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا
أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا
إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴿٥٤﴾

(৪৭) কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। (৪৮) পূর্বে তারা যাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (৪৯) মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি। (৫১) আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, অতঃপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (৫৩) এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫৪) শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ অর্থাৎ, কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন নেয়ামত, ধন-সম্পদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এস্থলে عَرِيضٍ অর্থাৎ, প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ বলেছেন। অর্থাৎ, জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি ও বার বার বলা উত্তম। — (বোখারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এস্থলে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, আমি আমার কুদরত ও তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। آفاق শব্দটি افق -এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরী হলে ইস্পাত নির্মিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যাঁর কোন সমকক্ষ হতে পারে না। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِينَ

সূরা হা-মীম সেজদাহ্ সমাপ্ত

سُورَةُ الشُّورَىٰ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَخَمْسُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حم ﴿١﴾ عسق ﴿٢﴾ كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ
حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ
فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمِ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾

সূরা আশ-শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) আইন, সীন, ক্বা-ফ। (৩) এমনিভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। (৪) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। তিনি সমুন্নত, মহান। (৫) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব। (৭) এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। (৯) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? পরন্তু আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ্‌—আমার পালনকর্তা। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।

সূরা আশ-শূরা

يَتَفَطَّرْنَ —এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোন বস্তুর উপর ভারী বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী। এটা অবান্তরও নয়। কেননা, এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম দেহও একত্রিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়।—(বয়ানুল -কোরআন)।

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ . أُمَّ الْقُرَىٰ এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى ولولا انى اخرجت منك ماخرجت—তুমি আমার কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

وَمَنْ حَوْلَهَا —অর্থাৎ, মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ, যে ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র ফয়সালাই আসল ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ — অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রসূলের এবং কোন কোন আয়াতে শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নয়। কেননা, রসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলারই ফয়সালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী ফয়সালা করলে তা আল্লাহ্‌র ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন, তবে ইজতিহাদের ভিত্তিও কোরআন ও সুন্নাহ্‌ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলারই ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এদিক দিয়ে খোদায়ী বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বোঝার যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই শরীয়তের বিধান।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ
مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُمْ
مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى ؕ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ
لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ
يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ وَمَا
تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾
فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا
حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

(১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। (১৩) তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। (১৫) সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন ; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আঃ) ও সর্বশেষ আমাদের রসূল (সাঃ) এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর নবুওয়ত স্বীকার করত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)–এর ভক্ত ইহুদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আযহাবেও পয়গম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচ জন পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ —পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী (সাঃ)–এর নাম প্রথমে এবং নূহ (আঃ)–এর নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুওয়ত বণ্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে।—(ইবনে মাজা, দারেমী)

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তাঁর নামের উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্বপ্রথম পয়গম্বর ছিলেন আদম (আঃ)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ (আঃ)–এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে নূহ (আঃ)–ই প্রথম পয়গম্বর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ —এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, যে দ্বীন বা ধর্মমতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয় ; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ঃ এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মৌলিক বিশ্বাস–যেমন তওহীদ, রেসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক এবাদত।—যেমন, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মত অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গম্বরগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا – অতএব

পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেনঃ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ –এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।—(মাযহারী)

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه–অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন, يد الله على الجماعة —অর্থাৎ, জামাতের উপর আল্লাহ্র রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা—পৃথক না থাকা।—(মাযহারী)

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تفرق শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্যে বিপদজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয়ঃ শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোন বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল থেকে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফেকাহ্বিদগণ একমত।

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ –অর্থাৎ, তওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ, খেয়ালখুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরলপথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে—

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ — অর্থাৎ, সরলপথ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। (এক) আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কাউকে সরলপথের জন্যে মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলেন। যেমন, পয়গম্বর ও ওলীগণকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলেঃ

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ — অর্থাৎ, আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্যে খাঁটিভাবে তৈরী করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কোরআনে مخلص (অর্থাৎ, মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অভিমুখী হয় এবং তাঁর দ্বীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্ তাকে সত্য ধর্মের হেদায়েত দান করেন। وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ –বাক্যের অর্থ তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব, মুশরেকদের কাছে তওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ —হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে কোরাইশ কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরলপথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাসের মতে, যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গম্বরগণের ধর্ম থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সরলপথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কোরাইশ কাফেরদের কথা বলা হোক—উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۚ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

হাফেয ইবনে-কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নযীর। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে فَلِذٰلِكَ فَادْعُ –অর্থাৎ, যদিও মুশরেকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয় বিধান وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ অর্থাৎ, আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ شيبتنى هود অর্থাৎ, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হুদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান—وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ –অর্থাৎ, প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান— وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ
دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾
اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ
اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾
اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾
مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ
كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ
مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ
مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا
يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

(১৬) আল্লাহ্‌র দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহ্‌ই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটবর্তী। (১৮) যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে তড়িৎ কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কেয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে। (১৯) আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না। (২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার।

مِنْ كِتٰبٍ – অর্থাৎ, আপনি ঘোষণা করুন ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী। পঞ্চম বিধান— وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ –এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে عدل এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি—এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না। ষষ্ঠ বিধান- اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ আমাদের সকলের পালনকর্তা। সপ্তম বিধান لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ — অর্থাৎ , আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, জেহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশতঃই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে। —(কুরতুবী)

অষ্টম বিধান— لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ, সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই। নবম বিধান- اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا —অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান— وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসীকে দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফের শুনতে ও মানতেই রাযী নয়, তারা এরপরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খ্রীস্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কোরাইশ কাফেরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কোরআন পাক উল্লেখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতণ্ডা অসার ও পথভ্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গযব তোমাদের উপরই পড়বে। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহ্‌র হক ও বন্দার হকের জন্যে পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ এখানে 'কিতাব' বলে কোরআনসহ সমস্ত ঐশীগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং 'হক' বলে পূর্বোক্ত সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে। ميزان -এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ি-পাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় হক এবং ميزان শব্দের মধ্যে বন্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

'মুমিনরা কেয়ামতকে ভয় করে'—এর অর্থ কেয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্তু নিজেদের কর্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়—তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘ্র কেয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনে কেয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ —অভিধানে لَطِيْفٌ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস-এর অনুবাদ করেছেন 'দয়ালু' এবং মুকাতিল করেছেন 'অনুগ্রহকারী।'

হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত বন্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হয়। বন্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী لَطِيْفٌ শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ্ তাআলা রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহ্‌র রিযিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারে রিযিক বণ্টনে তিনি বিভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারেফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, রিযিকের ব্যাপারে বন্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুকম্পা দু'রকম। (এক)—তিনি কাউকে তার দ্বারা জীবনের রিযিক এক যোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাযত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাযতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।—(মাযহারী)

একটি পরীক্ষিত আমল ঃ মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহঃ) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার اَللّٰهُ لَطِيْفٌ اَلْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ আয়াতটি –পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিযিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى –সার-সংক্ষেপে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রেসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্যে আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নযীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেন ঃ

ولا عيب فيهم غيران سيوفهم . . بهن فلول من قراع الكتائب

অর্থাৎ, কোন এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্যে এটা কোন দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। জনৈক উর্দু কবি

তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সরাকথা এই যে, আত্মীয় বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বোখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ্ তাআলাই দেবেন। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকলের সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسط الناس فى قريش

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোরাইশদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, আপনি মুশরেকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর।—(রূহুল—মা'আনী)

ইবনে জরীর প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন—

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্যে তা গৌরবের বিষয় হবে না।—(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাযিল হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই সুয়ূতী ও হাফেয ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এ রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্বরগণ বিশেষতঃ সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত ঃ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোন গুরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোন হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ইমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলেমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন—

ঃ হে আশ্বারোহী, তুমি মুহাস্সাব উপত্যকার অদূরে থাম। প্রত্যুষে যখন হাজীদের স্রোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেযী।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ
اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾
وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ
بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ
مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ ۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ
مِنْ ۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾ وَ
مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ
وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا
كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ
فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

(২৩) এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তার সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্যে তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী। (২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুতঃ তিনি মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরনিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (২৬) তিনি মু'মিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২৭) যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারীও নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত, রেসালত ও কোরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গম্বরের মো'জেযা ও যাদুকরের যাদু—এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরগণের নবুওয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশে তাদেরকে মো'জেযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোন এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মো'জেযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুওয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন না; নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই তার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাকে নবুওয়ত দান করেন, তাঁকে মো'জেযাও দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুওয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাযিল করেন।

কোরআন পাকও এক মো'জেযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী (সাঃ)-এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মো'জেযা উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওহী ও রেসালত সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্ তাআলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপ ঃ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গোনাহ্ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

(এক)—বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, (দুই)—অতীতের গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে এবং (তিন)—ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরয কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাযা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধন-সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিসদেরকে ফেরৎ দেবে। কোন ওয়ারিস না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে—যেমন, কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে, অথবা কারও গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যেই আল্লাহ্র ওয়াস্তে গোনাহ্ বর্জন করতে হবে,

শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ্ থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ্ থেকে তওবা করলেও আহ্লে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গোনাহ্ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ্ বহাল থাকবে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে–নুযুল ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের এবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয় ; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যতঃ কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিযিক ও নেয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। – (তফসীরে–কবীর)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় ; যারা কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) বলেন, আমরা যখন বনূ–কুরায়যা, বনূ–নুযায়ের ও বনূ–কায়নুকার অগাধ ধন–সম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর ইবনে হুরায়স (রাঃ) বলেন, সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে এরূপ আকাংখা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল–মা'আনী)

দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ ঃ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধন–সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ–লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করায়ত্তকরার জন্যে জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি–কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তাআলা সব মানুষকে সব রকম নেয়ামত না দিয়ে এভাবে বণ্টন করেছেন যে, কাউকে, ধন–সম্পদ বেশী দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশী সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সম্যক জানেন কার জন্য কোন নেয়ামত উপযুক্ত এবং কোন নেয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নেয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নেয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তা–ভাবনা করে। আর আল্লাহ্ তাআলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব, যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা–কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা–আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন–সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখ্রুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ আয়াতের তফসীরে ইন্শাআল্লাহ্ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য ঃ এখানে খটকা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন–সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ–লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণতঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নেয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ–লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তাফসীরের সার–সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহঃ) 'বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন— (বয়ানুল–কোরআন)

দুনিয়াতে ধন–সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ–লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা

নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য–মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হত না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই থাকবে—মন্দের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا (মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে "নিরাশ হওয়ার পর" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয় হুঁশিয়ার করারও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তদ্বির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

وَمَا يَبُثُّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ —অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دَابَّةٍ বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীব-জন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্টবস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তুও হতে পারে, যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্বব্যবস্থার উপযোগিতাবশতঃ আল্লাহ্ তাআলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেননি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবাই আল্লাহ্‌র তওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারও কোন কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ্ তাআলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে— এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গোনাহ্‌র কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক গোনাহ্‌র শাস্তি দেন না, বরং যেসব গোনাহ্‌র শাস্তি দেন না সেগুলোর সংখ্যাই বেশী। হযরত আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহ্‌র কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ্ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম 'দাওয়ায়ে-শফী' গ্রন্থে লিখেন,—গোনাহ্‌র এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গোনাহ্ হতে পারে না। তারা যদি কোন কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।—(মাযহারী)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ
فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّيَعْلَمَ
الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ
كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى
بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ
فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ
سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ
يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

(৩২) সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী, কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন (৩৫) এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই। (৩৬) অতএব, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে ; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন নাই। (৪১) নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। (৪২) অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নেয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নেয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্ম ও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নেয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ্ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নেয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না, বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। 'আইন অনুযায়ী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নেয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুন ঃ

প্রথম গুণ— وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ —অর্থাৎ, সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় গুণ — وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ, যারা মহাপাপ বিশেষতঃ অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ্ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নেসায় বর্ণিত হয়েছে।

কবীরা গোনাহ্‌সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্‌ই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহ্‌কে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ্ সাধারণ কবীরা গোনাহ্ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানের জন্যে **فواحش** শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, সেগুলোকেও **فواحش** তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ– وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ –অর্থাৎ, তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ–অবৈধ, সত্য–মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তাআলা মুমিন ও সৎকর্মীদের এগুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ –অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ – এর অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। যে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূল। এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরয কর্মসমূহের মধ্যে নামায

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামায পড়ে।

পঞ্চম গুণ وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ — অর্থাৎ, তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ, যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে امر শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা, সাধারণের পরিভাষায় امر শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ আয়াতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন-দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে-কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদীতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজীব।

ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষ কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা ঃ খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে বললেন- এর জন্যে আমার উম্মতের এবাদতকারীদেরকে একত্রিত করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারও একক মতে ফয়সালা করো না।

রূহুল -মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-এলম ও বে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ, যে কাজের পরিণতি তার জন্যে মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বোখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন ঃ

ماتشاور قوم قط الا هدوا لارشد امرهم -যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ, জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে—তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্যে ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয়ঃ হবে। অর্থাৎ, বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।—(রূহুল-মা'আনী)

ষষ্ঠ গুণ— وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাযের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্যে মসজিদসমূহে দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।—(রূহুল-মা'আনী)

সপ্তম গুণ— وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ — অর্থাৎ, তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালংঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা লংঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে— وَجَزٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا —অর্থাৎ, মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারিরীক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণতঃ কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্যে তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেয়া জায়েয হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু পরে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ —অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرٰىهُمْ
يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ
وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ
مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا
فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا
الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ
قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ
حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾

(৪৪) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্যে তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী নেই। পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? (৪৫) জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। মুমিনরা বলবে, কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী আযাবে থাকবে। (৪৬) আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত হয়, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তাআলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, (৫০) অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ্ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।

উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা ঃ হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাযী আবুবকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তারা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম।

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি মুমিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُوْنَ -এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ —বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেয়া উত্তম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মুমিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ —বাক্যে তাদেরকে কেয়ামতের আযাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا —বাক্যের মর্ম তাই।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ ..... —থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে।

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا
وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ, মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোন দখল নেই। পিতা-মাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলাই কাউকে কন্যা-সন্তান,

কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন—তার কোন সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কন্যা-সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র-সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবীর জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মূসা (আঃ)-এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনা-সামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সরাসরি ও সামনা-সামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আঃ)-ও সামনা-সামনি কথা শুনেন নি, বরং যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়ায শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তাআলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। (এক) وَحْيًا অর্থাৎ, কোন বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারে হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) القى فى روعى বলতেন। অর্থাৎ, এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না ; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায় أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার অন্তরাল থেকে কোন কথা শোনা। মূসা (আঃ) তূর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ্ তাআলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাত লাভ করেননি। তাই رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব لَن تَرَىٰنِي বলে দেয়া হয়।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোন বস্তু নয়, যা আল্লাহ্ তাআলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোন বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ্ তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জমাআতের মাযহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যতঃ ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ্ তাআলার সামনা-সামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্ তাআলার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখোমুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নীতির পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতের নয়—আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়— أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا — অর্থাৎ, জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার পাঠ করে শুনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণ এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে وحى শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তাআলার সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বোখারীর একদীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰبُ
وَلَا الْإِيمَٰنُ وَلٰكِن جَعَلْنٰهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ
وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلٰى صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُۥ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَنَضْرِبُ
عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا
مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِۦ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضٰى مَثَلُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّ
جَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۖ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

(৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যাদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন— (৫৩) আল্লাহ্‌র পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ্ তাআলার কাছেই সব বিষয়ে পৌঁছে।

সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৮৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, (৩) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (৪) নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে-মাহফুযে। (৫) তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়—এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোরআন প্রত্যাহার করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৮) সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (৯) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ (১০) যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতঃপর তদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ –এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি—হতে পারেও না। তবে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ করে বন্দাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ্ তাআলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলুন—ইহুদীদের এ দাবী মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ্ তাআলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রসূলগণ কোন কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে রসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। তাঁর মনমানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুওয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মুমিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চরিত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় পয়গম্বরকে বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোন পয়গম্বরগণের বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুওয়ত দাবীর পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী তাঁর তফসীরে এবং কাযী আয়ায "শেফা" গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন।

সূরা আয যুখরুফ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন, وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মে'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে।— (রুহুল-মা'আনী)

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণতঃ পরবর্তী দাবীর দলীল হয়ে থাকে। এখানে কোরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে একাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا
اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا
لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ
عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ
بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ
لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا
فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ
الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ
مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ
كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ
اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ مَآ
اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ
اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

(১২) এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্যে যানবাহনে পরিণত করেছেন, (১৩) যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নেয়ামত স্মরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (১৪) আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (১৫) তারা আল্লাহ্‌র বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র-সন্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহ্‌র জন্যে যে কন্যা-সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র জন্যে বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম? (১৯) তারা নারী স্থির করে ফেরেশতাগণকে, যারা আল্লাহ্‌র বন্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। এখন তাদের দাবী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, রহমান আল্লাহ্‌ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। (২৩) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় ঃ

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ (আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশ গ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্বীন অথবা পাপাচারী।

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا (তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা করেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মত এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ (তোমাদের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। (এক) যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরী করে। (দুই) যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। 'নৌকা' বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্‌ তাআলার মহা অবদান। চতুষ্পদ জন্তু যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরীতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলী সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যতঃ মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ্‌ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।

ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ (এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহ্‌র দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নেয়ামতসমূহ মুমিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসিনতা ও বেপরওয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মুমিন আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহকে চিন্তায়

উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তুসম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলা-ফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই এবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীনে' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর কিতাব 'মোনাজাতে মকবুলে' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়াঃ سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا (পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন)। এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তুর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলবে, অতঃপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করে سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে।— (কুরতুবী)

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ (আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব)। এটা যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তিদান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিয়ে যাব)। এ বাক্যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্যে সৎকর্ম ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا (তারা আল্লাহ্র বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লহ্র অংশ স্থির করেছে)। এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্র কন্যা-সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরেকদের এই বাতিল দাবীর যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ্ তাআলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ্ তাআলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্যে তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলাবাহুল্য যে কোন প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্র মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ (যে অলংকার ও সাজ – সজ্জায় লালিত – পালিত হয়)-এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্যে অলংকার ব্যবহার এবং শরীয়তসম্মত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা জায়েয। এ বিষয়ের ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারা দিনমান সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ (এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম)। উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবী প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণতঃ নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي
بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَ
جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ
هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا
نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ
يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ
أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

(২৪) সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। (২৬) যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দিকেই আকৃষ্ট থাকে। (২৯) পরন্তু আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা যাদু, আমরা একে মানি না। (৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম। (৩৩) যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যেই যারা ভয় করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরেকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বলাবাহুল্য, সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁরা গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরেকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ (তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদী বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেননি, বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার ওসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থী ছিল। স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশপাশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইবরাহীম (আঃ)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তান-সন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধধর্মে কায়েম থাকার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে সন্তান-সন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, তেমনি পয়গম্বরগণের সুন্নত বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা স্থান বিশেষ অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (রহঃ) 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্যে সযত্নে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ পদ্ধতির প্রতি আজকাল

ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতারই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা মুশরেকদের একটি আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে একথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কিরূপে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কোরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-ই নন দুনিয়াতে এ যাবৎ যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন, তখন তারা পাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুওয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হল না কেন? মুহাম্মদ (সাঃ) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুওয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মাসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমরা সকফী অথবা কেননা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।— (রূহুল-মা'আনী)

মুশরেকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ কাকে নবুওয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছন না। নবুওয়তের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী একাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুওয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই নয়। নবুওয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্তিত্ব ও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজ-কারবার পরিচালানা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা বাবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেননি, বরং একাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব, যখন নিম্নস্তরের একাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুওয়ত বন্টনের মত মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরেকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরী।

জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবনব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্র গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মিটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তাআলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানি-রফতানির' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রফতানির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশী, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলোর সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রফতানির তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশী। ইসলাম আমদানি ও রফতানির এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে বিষয়াদি সাধারণতঃ স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনিভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধান প্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণতঃ দিন কাজের জন্যে এবং রাত্রি নিদ্রার জন্যে। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণতঃ কে জ্ঞান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকা ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তাআলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে— كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্যে রিযিকের দ্বারা বন্ধ করে দেয়ার স্বাধীনতা দেয়নি ; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকা বাজী, জুয়া, মজুদদারী ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও যাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদীব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেয়ারজন্যে সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য ঃ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ আমি একেকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক—এ অর্থে সামাজিক সাম্য কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশী, তার অধিকারও তত বেশী। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্বে-কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোন কোনটি পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশী, তার অধিকারও বেশী। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশী দেয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্ তাআলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা, কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানি তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশী এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবী করে, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। (১) তবে কার কর্তব্য বেশী, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্যে মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখতে একে তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনের ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্যে মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমতঃ এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্যে প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি যদ্দ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির ঊর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানি ও রফতানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশী চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য একারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানি সমান হলে কেউ কারও কোন কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানি ও রফতানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তারা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমতঃ হালাল-হারাম ও

জায়েয-নাজায়েযের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়তঃ নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরী নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলাবাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্যে উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশী।

ইসলামী সাম্যের অর্থ ঃ উল্লেখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে একথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ও ন্যায় সুবিচারের দাবী নয়। এ সাম্য কার্যতঃ কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেওর কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লেখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্যে দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)

খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেনঃ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধন-সম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্যে বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজী, জুয়া, মজুদদারী এবং ইজারাদারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ওশর, খেরাজ, ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এত সবের পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়।

ধনদৌলতে প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় ঃ কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হল না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুওয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুওয়ত দেয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كافرا منها شربة ماء অর্থাৎ, দুনিয়া যদি আল্লাহ্র কাছে মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ্ তাআলা কোন কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুওয়তের জন্যে কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল।

আয়াতে "সব মানুষ কাফের হয়ে যেত" এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফের হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্র কিছু বান্দাহ্ আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। এরূপ কিছু লোক সম্ভবতঃ তখনও ঈমানকে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লবণের তুল্য।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾
وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾
حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ
فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾
اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ
بِالَّذِىْۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ
لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً
يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَاۤ اِذَا هُمْ
مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَ
اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ
السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত। কত হীন সঙ্গী সে! (৩৯) তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকের আযাবে শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। (৪০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? (৪১) অতঃপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। (৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব, আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। (৪৪) এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে উল্লেখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে? (৪৬) আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর সে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। (৪৭) অতঃপর সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্যবিদ্রূপ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তাই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্যে তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ ঃ وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (কুরতুবী) এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা জিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎকর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মত লেগেই থাকে।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ .... —এ আয়াতের দু'রকম তফসীর হতে পারে (এক) যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। কেননা, তখন তোমরা সবাই আযাবে শরীক থাকবে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌঁছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আযাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় اَنَّكُمْ হবে ينفع ক্রিয়ার কর্তা।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ (এ কোরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু।) ذكر এর অর্থ এখানের সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআর পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ্ তা' আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দোয়া করেছিলেন — وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ (তফসীর কবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারও কারও মতে কোরাইশ গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ (আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি,

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ
مَهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ
أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ
ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ
نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَ
لَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

(৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৫১) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (৫২) আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৫৩) তাকে কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না, অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে? (৫৪) অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৫) অতঃপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম। তাদের সবাইকে। (৫৬) অতঃপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্যে। (৫৭) যখনই মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হট্টগোল শুরু করে দিল (৫৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (৫৯) সে তো এক বান্দাই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী-ইসরাঈলের জন্যে আদর্শ। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। (৬১) সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে, কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তাআলা যদি মো'জেযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মে'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পয়গম্বরগণের ইমামত শেষে তাঁদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণতঃ বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল।

বর্তমান তওরাতে আছে ঃ যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউই নেই।—(এস্তেছনা—৩৫—৪)

শুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।—(এস্তেছনা (৪—৬) হযরত আশিইয়া (আঃ)-এর ছহীফায় আছেঃ

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদাওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই। (ইয়াহিয়া ৬-৫ ঃ ৪৫)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছেঃ

'হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদাওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালবাস। (মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬)

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেনঃ

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহ্‌কে এবং ঈসা মসীহ্‌কে—যাকে তুমি প্রেরণ করেছ—চিনবে (ইউহান্না ৩-১৭)

হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা পূর্বে বার বার উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফেররা তাঁর নবুওয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি মূসা (আঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুওয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি মক্কার কাফেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ –(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মূসা (আঃ)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে

দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পূর্ববস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে মূসা (আঃ)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে 'কথা বলার শক্তি' বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বোঝানো যেতে পারে। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত-প্রমাণ মূসা (আঃ)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা মূসা (আঃ) দলীল-প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা জওয়াব করে দিয়েছেন। —(তফসীরে কবীর, রূহুল মা'আনী)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ –এর দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। (এক) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল— طلب منهم الخفة وجدهم خفيفة فى مطاوعته احلامهم (দুই) সে তার সম্প্রদায়কে বেওকূফ পেল —(রূহুল-মা'আনী)

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا –এটা اسف থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ, 'অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণতঃ এভাবে করা হয়—যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ্ তাআলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম। —(রূহুল মা'আনী)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ – এসব আয়াতের শানে নুযূলে তফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন, يا معشر قريش لا خير فى احد يعبد من دون الله –অর্থাৎ, হে কোরাইশগণ , আল্লাহ্ ব্যতীত যারই এবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। কোরাইশরা বলল, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত করে ; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কোরআন পাকের আয়াত — اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ –(তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে)। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যিবা'রা (যে তখনও কাফের ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব রয়েছে। তা এই যে, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর পূজা করে। অতএব, তারা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরেক কোরাইশরা খুবই আনন্দিত হল। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন। —(ইবনে-কাসীর)

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরেকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) খোদায়ী দাবী করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খ্রীষ্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা এমন আয়াত নাযিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট। কেননা, যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহ্র কোন আদেশ বলে মনে করেনি এবং ঈসা (আঃ)-এরও এরূপ বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কোরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ড করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খ্রীষ্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবী করে বসলেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী ; কিন্তু নিজেই নিজের এবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফেরাউন, নমরূদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি কোন পর্যায়ে নিজের এবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রীষ্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর এবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রীষ্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথায়, এবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত কাফেরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন (অর্থাৎ, ঈসা (আঃ) তাঁরও তো এবাদত হয়েছে।) সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের এবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আঃ)-এর এবাদত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ – এটা খ্রীষ্টানদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশী স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এপর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ, মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ (এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা [আঃ] কেয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।) এর দু'রকম তফসীর করা হয়েছে। তফসীরে সার-সংক্ষেপে উল্লেখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্ তাআলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্যে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় আকাশ থেকে

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ
مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾
لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ
لَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا
رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তাঁর এবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। (৬৬) তারা কেবল কেয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। (৬৭) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। (৭০) জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালেম। (৭৭) তারা ডেকে বলবে, হে মালেক, পালনকর্তা আমাদের কিস্‌সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। (৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ। (৭৯) তারা কি কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি।

অবতরণ কেয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ – (এবং যাতে আমি তোমাদের কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। 'কোন কোন বলার কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেননি।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রকৃত বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয় ঃ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ – (খোদাভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুবর্গই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।) এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্যে হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কেয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফের বন্ধু। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হল। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল,—ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্যে আমি যে পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার, তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশী। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ্ একত্রিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনও আপনার কাছে হাযির হব না। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে হেদায়াত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ্ একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল—এ

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾
سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ
يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ
إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হাঁ, শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বলুন, দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি সর্ব প্রথম তার এবাদত করব। (৮২) তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৩) অতএব, তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে । তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যার। তাঁরই কাছে আছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্‌। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসূলের এই উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তা, এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৮৯) অতএব ,আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম' । তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

সূরা আদ দোখান

মক্কায় অবতীর্ণ, ঃ আয়াত ৫৯

(১) হা-মীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহ্‌ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ –(যদি রহমান আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার এবাদত করতাম)। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না ; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যেএকথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা, মাঝে মাঝে এধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ – এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গযব নাযিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর, অপরদিকে 'রহমতুল্লিল-আলামীন' ও শফীউল মুযনিবীন' রূপে প্রেরিত রসূল (সাঃ) স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলছেন যে, তারা বার বার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসূল (সাঃ)-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এমন বেদনা মিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী وَقِيلِهِ এর এক আয়াত পূর্বে السَّاعَةُ শব্দের উপর معطوف হয়েছে। এ আয়াতের আরও কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণতঃ واو অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় এবং إِنَّ هَٰؤُلَاءِ কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রুহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وَقُلْ سَلَامٌ –পরিশেষে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্গম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। 'সালাম বলুন'-এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা, কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, 'আমার পক্ষ থেকে সালাম' অথবা 'তোমাকে সালাম করি।' এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য-এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে السلام عليكم বলা অথবা سلام বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত। —(রুহুলমা'আনী)

সূরা যুখরুফ সমাপ্ত